গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে সুলভ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চিহ্ন নাই। সেন মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করা হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা হইতেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্ভব।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আগে বিবেচনা করা যাউক।

পৃথিবীর সমস্ত লোক যে ধর্ম্মের অনুসরণ করেনা, তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোক—তা তাদের সংখ্যা কয়েক শত, বা কয়েক সহস্র, বা কয়েক লক্ষ, এমন কি কয়েক কোটিও হইতে পারে, এমন কতকগুলি লোক—মাত্র যে ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহাকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মকেই সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে হয়; কারণ, কোনও একটী ধর্ম্মই পৃথিবীর সমস্ত লোক কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় না। যাঁহারা একই নীতির একই আদর্শের বা একই ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ একটা সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। এইরূপে হিন্দু-সম্প্রদায়, মুসলমান-সম্প্রদায়, খৃষ্টীয়ান-সম্প্রদায়, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়, জৈন-সম্প্রদায়, আবার হিন্দুদের মধ্যে শৈব-সম্প্রদায়, শাক্ত-সম্প্রদায়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভৃতি নাম প্রচলিত আছে। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকেই যদি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা হয়, তাহা হইলে সকল ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে; সুতরাং "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" কথাটার প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাই থাকেনা; যেহেতু, যাহা সাম্প্রদায়িক নয়, এমন কোনও একটা ধর্ম্ম হইতে পার্থক্য সূচনার জন্যই "সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম"-কথাটার প্রয়োগ। উল্লিখিত অর্থ মানিতে গেলে সকল ধর্ম্মই যখন সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে, কোনও ধর্ম্মই যখন অসাম্প্রদায়িক থাকে না, তখন নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে, সম্প্রদায়-বিশেষের আচরিত বলিয়াই কোনও ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলা সমীচীন নয়।

রস-স্বরূপ পরতত্ত্ব বস্তুতে অনন্ত রস-বৈচিত্রী বিদ্যমান। সকল বৈচিত্রীতে সকলের চিত্ত সমান ভাবে আকৃষ্ট হয় না। লোকের রুচি এবং প্রকৃতি একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্রীতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্ত সমধিক ভাবে আকৃষ্ট হয়। তাই উপাস্য-ভাবের এবং উপাসনা-প্রণালীর পার্থক্য থাকিবেই এবং বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপাসকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেনই; কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিকূলতা থাকিবে, তাহারও কোনও ন্যায়সঙ্গত হেতু নাই। যেখানে লক্ষ্যবস্তুর সহিত পরিচয়ের অভাব, সেই স্থানেই অজ্ঞতাবশতঃ মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ,—সেখানেই অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা—সেখানেই সঙ্কীর্ণতা। এই সঙ্কীর্ণতা যখন কোনও একটী সম্প্রদায়ে ব্যাপকতা লাভ করে, তখনই আমরা সেই সম্প্রদায়ের ভাবকে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া থাকি।

সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতা সমাজবিষয়কও হইতে পারে এবং ধর্ম্মবিষয়কও হইতে পারে। অনাচরণীয়তা ও অস্পৃশ্যতাদি হইল সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা। "আমি যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজই কুলীন, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, আচার-সম্পন্ন; অপর সমাজ বা অপর কোনও কোনও সমাজ আমার সমাজ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে হেয়"—সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য-বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ এইরূপ সঙ্কীর্ণতাই সমাজ-বিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার হেতু। আর "আমি যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি, তাহাই মুক্তির একমাত্র উপায়, আমার যাহা সাধন-প্রণালী, তাহাই একমাত্র ফলপ্রদ পন্থা; অপরের সাধন-প্রণালী ভ্রান্তিপূর্ণ, নিরর্থক; অপরে মুক্তির যে ধারণা পোষণ করে, তাহাও ভ্রান্ত"—ইত্যাদি রূপ যে সঙ্কীর্ণ ভাব, তাহাই ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতার মূল। এইরূপ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই একটা গণ্ডীবদ্ধতার ভাব আছে—

"আমি যে গণ্ডীতে বা যে মণ্ডলীতে আছি, তাহাই সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট; অপরের গণ্ডী সর্ব্ববিষয়ে নিকৃষ্ট"—এইরূপ একটা ভাব।

ধর্ম্মে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সাম্প্রদায়িকতা। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই দুইটা দিক আছে, সামাজিক বা ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। সাম্প্রদায়িকতা দুই দিকেই থাকিতে পারে; সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই দুইটা দিকই বিচার করিতে হইবে।

সামাজিক বা ব্যবহারিক দিকেরও আবার দুইটা শাখা আছে—বংশ বা জাতিবিচারমূলক ব্যবহার এবং পারমার্থিক ধর্ম্মযাজনে অধিকার।

গোস্বামিগ্রন্থে গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বংশ বা জাতিবিচারমূলক যে ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সামাজিক উদারতার আদর্শস্থানীয়। কাশীখণ্ডের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ ১০।৭৮॥"—ব্রাহ্মণই হউন, ক্ষত্রিয়ই হউন, বৈশ্যই হউন, কি শূদ্রই হউন, কিম্বা অপর কোনও জাতিই হউন, যিনি বিষ্ণুভক্তিযুক্ত, তিনি সর্ব্বোত্তমোত্তম।" "শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। ১০।৬৮॥—বিষ্ণুভক্ত শ্বপচও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"—ইত্যাদি নারদীয়-বচনও শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ধৃত হইয়াছে। এই মর্ম্মের বহু প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দৃষ্ট হয়। এ সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়, ভগবদ্‌ভক্তের বা বৈষ্ণবের কুলের বিচার বৈষ্ণবাচার্য্যগণ করেন নাই। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপোষণ বরং অপরাধজনক বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়া গিয়াছেন। "শূদ্রং বা ভগবদ্‌ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ ১০।৮৬॥" জাতিকুল অপেক্ষা জীবের স্বরূপের প্রতিই—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। ২।২০।১০১।"—এই তথ্যের প্রতিই বৈষ্ণবগণ বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কেবল অপরের সম্বন্ধে নয়, নিজের সম্বন্ধেও জাতিকুলের সংস্কার যাহাতে চিত্ত হইতে দূরীভূত হইতে পারে, এবং স্বীয় স্বরূপের সংস্কারই যাহাতে চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও আচার্য্যগণ করিয়া গিয়াছেন। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ চৈঃ চঃ ধৃত পদ্যাবলীবচন।—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই, বাণপ্রস্থী নই, যতি নই—চারিবর্ণেরও কেহ আমি নই, চারি আশ্রমেরও কেহ আমি নই; আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।" নিজের সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তারই গোড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যবস্থা।

এইরূপে সকলেরই একই জীবত্বের সাধারণ ভূমিকায় অবস্থিতির জ্ঞানে পাছে কাহারও প্রতি ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞার ভাব কিম্বা আরও অধিকতর অবাঞ্ছনীয় কোনও ভাব—আসিয়া পড়ে, তাই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে,—এমন কোনও কাজ করিবে না, বা এমন কোনও ব্যবহার করিবে না বা কথা বলিবে না, এমন কোনও ব্যবহারের চিন্তাও মনে স্থান দিবে না, যাহাতে অপরের মনে কষ্ট হইতে পারে। "প্রাণিমাত্রে মনো বাক্যে উদ্বেগ না দিবে। ২।২২।৬৬।" সকলের অপেক্ষা সকল বিষয়ে উত্তম হইলেও নিজেকে অন্য সকল অপেক্ষা হীন মনে করিবে। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে। ২।২৩।১৪॥" কোনও রূপ হীন অভিমান যেন মনে স্থান না পায়; "উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। চৈঃ চঃ ৩।২০।২০" আর, নিজে কাহারও নিকটে সম্মানের প্রত্যাশা করিবে না; কিন্তু অপরকে সম্মান করিবে। "অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ৩।৬।২৩৫॥" সকলের মধ্যেই পরমাত্মা রূপে ভগবান্ সর্ব্বদা বর্ত্তমান; সুতরাং সকলেই ভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য—এরূপ মনে করিয়া, কেবল মানুষকে নয়, পরন্তু জীবমাত্রকেই সম্মান করিবে। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। ৩।২০।২০॥" এই উপদেশটী শ্রীলবৃন্দাবনঠাকুর আরও পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন—"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ চৈঃ ভা, অন্ত্য, ৩য় অধ্যায়।" গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের এই সামাজিক উদারতা, অস্পৃশ্যতা বা অনাচরণীয়তার বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে দেখা যায়, মহাপ্রভু যখন মধ্যাহ্নে ভিক্ষা

করিতে বসিতেন, যবনকুলোদ্ভব শ্রীল হরিদাসঠাকুর নিকটে কোথাও উপস্থিত থাকিলে নিজের নিকটে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার জন্য প্রভু তাঁহাকেও আহ্বান করিতেন; অবশ্য হরিদাসঠাকুর নিজের দৈন্যবশতঃ কৌশলে দূরে সরিয়া থাকিতেন; আবার এই হরিদাসকেই শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু শ্রাদ্ধপাত্র পর্য্যন্ত খাওয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন বৈষ্ণব জানিয়া এক অনাচরণীয় সনৌড়ীয়ার হাতেও তিনি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট উৎসবে হরিদাস-ঠাকুরের এবং সুবর্ণবণিক-বংশোদ্ভব উদ্ধরণদত্ত ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয় এবং বৈষ্ণবগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভক্তমাত্রকেই সামাজিকতার অনেক ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন-মহাবল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। ৩,১৬,৫৫-৫৬।" শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি।" এবং "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ।" শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষোড়শ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, কালিদাস-নামক জনৈক কায়স্থবংশীয় বৈষ্ণব ভূমিমালীজাতীয় ঝড়ুঠাকুরের পদধূলি এবং উচ্ছিষ্টও কৌশলে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি মহাপ্রভুর নিকটে এমন একটী বিশেষ কৃপা পাইয়াছিলেন, যাহা অপর কেহ পায় নাই। হরিদাস-ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে তাঁহার পার্ষদগণকে লইয়া তাঁহার সমাধি দিয়াছিলেন এবং মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া হরিদাস-ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব করিয়াছিলেন। তীর্থস্থলাদিতে এখন পর্য্যন্ত যবন-কুলোদ্ভব বৈষ্ণবদের সমাধিও বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইতেছে।

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।"—পদকর্ত্তার এই উক্তিতেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের সামাজিক উদারতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

এক্ষণে পারমার্থিক ধর্ম্মযাজনে অধিকার-বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মতে ভগবদ্‌ভজনে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। "শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥ ৩।৪,৬৩॥"

নববিধা-ভক্তির অনুষ্ঠানে, অর্চ্চন-মার্গে, শ্রীবিগ্রহ-সেবাদিতেও জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল বৈষ্ণবের অধিকার আছে। শালগ্রাম-সেবার অধিকার হইতেও বৈষ্ণবশাস্ত্র কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই, এমন কি স্ত্রীলোককেও না। শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম-বিলাসে ২৩শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ। দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥" টীকায় শ্রীপাদ সনাতন শ্লোকস্থ "পরৈঃ" শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—যথাবিধিদীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ, অর্থাৎ যথাবিধিদীক্ষা-গ্রহণপূর্ব্বক ভগবৎ-পরায়ণ—দ্বিজ, স্ত্রী এবং শূদ্র ইঁহাদের সকলের দ্বারাই শালগ্রাম-শিলাত্মক ভগবান্ পূজিত হইতে পারেন। এইরূপ বিধানের সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্র-প্রমাণরূপে স্কন্দপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥ ৫।২৪॥ টীকা হইতে জানা যায়, ইহা শ্রীনারদের উক্তি এবং এই শ্লোকোক্ত "সচ্ছূদ্রাণাং" শব্দের অর্থ—সতাং বৈষ্ণবাণাং শূদ্রাণাং—যাঁহারা বৈষ্ণব, এরূপ শূদ্রদের এবং "অন্যেষাং" অর্থ—অসতাং শূদ্রাণাং—অবৈষ্ণব শূদ্রদের। তদনুসারে শ্লোকের অর্থ হইল এই:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং বৈষ্ণব-শূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে; কিন্তু কখনও অবৈষ্ণব-শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। টীকায় সনাতনগোস্বামী অন্যান্য পুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। টীকায় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মধ্যদেশে, এই দেশে এবং দক্ষিণদেশে শ্রীবৈষ্ণবদেরমধ্যে উক্তরূপ আচারও প্রচলিত আছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে এখনও এই প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। তবে ইহা তত ব্যাপক নয়; তাহার কারণ বোধহয় এই যে, শালগ্রাম-চক্র সাধারণতঃ ঐশ্বর্য্যাত্মক বিগ্রহ; গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভাব মাধুর্য্যময়; তাই তাঁহারা—সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, নিতাইগৌর প্রভৃতির বিগ্রহ বা চিত্রপট পূজা করিয়া থাকেন। গোবর্দ্ধনশিলাকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ কৃষ্ণকলেবর বলিয়াছেন; তাই তাঁহারা এই শিলারও পূজা করেন। কুলাচার অনুসারে

ব্রাহ্মণ শালগ্রামচক্রের পূজা করিয়া থাকেন—তা তিনি বৈষ্ণবই হউন, কি শৈব বা শাক্তই হউন। তাই ব্রাহ্মণদের মধ্যেই শালগ্রামপূজার প্রচলন বেশী। ব্রাহ্মণেতর বংশোদ্ভব কাহারও তদ্রূপ কুলাচার বিরল; তাই তাঁহাদের মধ্যে শালগ্রামের পূজার প্রচলনও কম।

হরিভক্তিবিলাসের ৫।২২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বহুশাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানাং একত্রৈব গণনা—বিপ্রদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের একত্রই গণনা।" "বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি—ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈষ্ণবদিগের সাম্যই সিদ্ধ হইতেছে।" যেহেতু "ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব—ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়।" তাই "ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তম্—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধেরও শ্রীশালগ্রাম-পূজার কথা উক্ত হইয়াছে।" "শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ—শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষ্ণবদের অধিকার দৃষ্ট হয়।" শ্রীমদ্ ভাগবতের "যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রভাবে শ্বপচও সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের পক্ষে গুরু হওয়ার অধিকারও বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন —"কিবা শূদ্র কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ চৈ, চ, ২।৮।১০০॥" ব্যবহারতঃও ইহা দৃষ্ট হয়। বৈদ্যবংশোদ্ভব শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, কায়স্থ-বংশোদ্ভব শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং সদ্‌গোপবংশোদ্ভব শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুর—ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব মন্ত্র-শিষ্যও ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল—ভক্ত শ্বপচকেও বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্রাহ্মণের অধিকার দিয়াছেন, ভক্তব্রাহ্মণের অনুরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিধান দিয়াছেন। আর যাঁহারা ভক্ত নহেন, তাঁহাদিগকেও ভক্তির অনুষ্ঠানের জন্য সাদরে আহ্বান করা হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। বৈষ্ণবসমাজে সম্মান পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা নাই; সম্মান দেওয়ার জন্যই বরং সকলের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা।

এক্ষণে এই ধর্ম্মের পারমার্থিক দিকটার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। পারমার্থিক দিক-সম্বন্ধে বিবেচনার বিষয় প্রধানতঃ তিনটী—উপাস্য, উপাসনা এবং লক্ষ্য।

কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, শিব, দুর্গা, পরমাত্মা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের উপাস্য। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে এই সমস্ত উপাস্যের মধ্যে স্বরূপগত কোনও পার্থক্য নাই; ইঁহারা সকলেই পরতত্ত্ব-বস্তুর—স্বয়ংভগবানের—বিভিন্ন স্বরূপ; সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে ভেদ কিছু নাই; ভেদ আছে, মনে করিলে অপরাধ হয় বলিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন। "ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে ধরে নানাকার রূপ॥ চৈ, চ, ।২ ৯।১৪০-৪১॥" পরতত্ত্ববস্তু একই বিগ্রহে বিভিন্ন স্বরূপে নিত্য বিরাজমান —বিভিন্ন সাধককে কৃতার্থ করার নিমিত্ত। সাকার যিনি, নিরাকারও তিনি; সবিশেষ যিনি, নির্ব্বিশেষও তিনি। তাঁহার নির্ব্বিশেষ-রূপ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার সবিশেষ সাকার রূপও তেমনি সচ্চিদানন্দময়; সুতরাং সকল স্বরূপই নিত্য, সকল স্বরূপেরই পারমার্থিক সত্যতা আছে।

বৈদুর্য্যমণির দৃষ্টান্ত দ্বারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অভিন্নতা দেখাইয়া থাকেন। একই বৈদুর্য্যমণি যেমন স্বরূপে একই বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াও কোনও দিক হইতে নীল বর্ণ, কোনও দিক্ হইতে পীতবর্ণ ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ স্বরূপে অব্যাকৃত থাকিয়াও এক এক রকমের সাধকের নিকটে এক এক রকমে অনুভূত হন। "মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥" যে মণি একজনের নিকটে নীলবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই মণিই আর একজনের নিকটে পীতবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; তাহাদের অবস্থানের পার্থক্যই এই বর্ণানুভূতি-পার্থক্যের হেতু। তদ্রূপ, এক সাধকের নিকটে যিনি শিবরূপে অনুভূত হন, আর এক সাধকের নিকটে তিনিই কৃষ্ণ বা রামরূপে অনুভূত হন;

উপাসনার পার্থক্যই এই অনুভূতির পার্থক্য। নীলবর্ণ যে মণির, পীতবর্ণও সেই মণিরই। যিনি নীলবর্ণ মানেন, কিন্তু পীতবর্ণের নিন্দা করেন, তিনি ঐ মণিরই নিন্দা করেন। তদ্রূপ শিব যিনি, কৃষ্ণও তিনি; সুতরাং যিনি শিবকে মানেন, কিন্তু কৃষ্ণের অবজ্ঞা করেন, অথবা কৃষ্ণকে মানেন, কিন্তু সদাশিবের অবজ্ঞা করেন, তিনি স্বরূপতঃ অবজ্ঞা করেন সেই তত্ত্বের—যে তত্ত্ব শিব, কৃষ্ণাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাই যিনি এক ভগবৎ-স্বরূপের অবজ্ঞা করেন, তিনি ভগবত্তত্ত্বেরই অবজ্ঞা করেন। কোনও এক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি যিনি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্বের প্রতিই বিদ্বেষভাবাপন্ন—তিনি ভগবৎ-বিদ্বেষী। এক অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিলে সমস্ত দেহেই তাহার ফল অনুভূত হয়। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে ভেদজ্ঞান পোষণ করেন না বলিয়াই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ এরূপ মনে করিতে পারেন। তাই তাঁহারা শিব ও হরির নামগুণলীলাদির পার্থক্যজ্ঞানকে একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে—"পরাৎপরতরং যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ। ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্॥ যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্॥ মদ্‌ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ। উভৌ তৌ নরকং যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ১৪।৬৫। শ্রীহরি বলিয়াছেন, হরিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বৈকুণ্ঠগতি হয় সত্য; কিন্তু মহাদেবদ্বেষী না হইলেই তাঁহাদের ঐ বিষ্ণুধামপ্রাপ্তি হয়। মহাদেবের নিন্দাপূর্ব্বক নিরন্তর একান্তভাবে আমার অর্চ্চনা করিলেও অযুতসংখ্য নরকে গমন করিতে হয়। মদ্‌ভক্ত শিবদ্বেষী হইলে, অথবা শিবভক্ত মদ্দ্বেষী হইলে চন্দ্রসূর্য্যস্থিতিপর্য্যন্ত তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হয়।" শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়েও লিখিত হইয়াছে :—"শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র। এতেকে শঙ্কর-প্রিয় সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥ না-মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব। শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥" পুনরায়, শিবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি :—"যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে। সে আমারে মাত্র যেন অনাদর করে॥" আবার শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—"পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর। এই পাপে অনেকে যাইবে যমঘর॥" ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মত; এই মতে কোনও সম্প্রদায়ের উপাস্যের প্রতিই অবজ্ঞা বা কটাক্ষের অবকাশ নাই; সকল স্বরূপই সমানভাবে শ্রদ্ধার পাত্র; কারণ, সকল স্বরূপই একই বস্তুর বিভিন্ন বৈচিত্রী। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ইহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভক্তভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উপাসক হইয়াও শিব, নৃসিংহ, রাম, বিষ্ণু, ভগবতী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রত্যেক স্বরূপের শ্রীমন্দিরে গিয়াই প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন; সকল মন্দিরেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাবেশ অক্ষুণ্ণ ছিল; যে কোনও মন্দিরে যে কোনও স্বরূপের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত; কারণ, তিনি মনে করিতেন—এই শ্রীমূর্ত্তিও তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেরই একরূপ। শ্রীকৃষ্ণরূপে রসিকশেখর যে রস আস্বাদন করেন, শিবাদিরূপেও তিনি সেই রসেরই অপর এক বৈচিত্রী আস্বাদন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন-স্বরূপে তাঁর নিত্য-অবস্থিতির আনুষঙ্গিক কারণই হইল বিভিন্ন ভাবের উপাসককে কৃতার্থ করার জন্য তাঁর অভিপ্রায়। আর ইহার অন্তরঙ্গ কারণ হইল—রসিক-শেখরের বিভিন্ন-রসবৈচিত্রীর এবং বিভিন্ন প্রকারের ভক্তের বিভিন্ন প্রেম-রস-বৈচিত্রীর আস্বাদন। এই রসবৈচিত্রী আস্বাদনের ব্যপদেশেই আনুষঙ্গিকভাবে ভাব-বৈচিত্রীময় বিভিন্ন উপাসককে তিনি কৃতার্থ করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ এরূপ উদার মত পোষণ করেন বলিয়াই লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর চারিমাস অবস্থান এবং ভগবৎ-কথার আস্বাদন, রাম-উপাসক মুরারিগুপ্তের পক্ষে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদত্ব-প্রাপ্তি এবং ব্রজভাবের উপাসক রূপ-সনাতনের ও রাম-উপাসক অনুপমের একত্রে পরমানন্দে ভজনানুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল।

পরতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীদের সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিস্তর মতভেদ; তথাপি কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায় কখনও এমন কথা বলেন নাই যে, অদ্বৈতবাদীদের উপাস্য নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যত্ব নাই, কিম্বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অলীক বা কাল্পনিক।

ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ধারণা অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক। সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই এই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সম্ভব।

তারপর উপাসনা সম্বন্ধে। কোনও সম্প্রদায়ের উপাসনা একেবারে নিরর্থক—এমন কথা গৌড়ীয় সম্প্রদায় কখনও বলেন নাই। লক্ষ্যভেদে উপাসনাভেদ; পরতত্ত্বের অনুভূতির ভেদ। "উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা। ১।২।১৯ ॥ "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ ২।২০।১৩৪ ॥" এসমস্ত উক্তিই বিভিন্ন সাধন-প্রণালীর সার্থকতার প্রমাণ। যিনি যেভাবে ভগবান্‌কে বা পরতত্ত্ববস্তুকে পাইতে চাহেন, তাঁহার উপাসনাও তদনুরূপ হইবে, নিজ নিজ ভাবের অনুকূল উপাসনাই সাধকদের পক্ষে কর্ত্তব্য। "যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম। ২।৮।৬৫ ॥" এবিষয়ে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই।

তারপর লক্ষ্য। ভিন্ন ভিন্ন সাধক-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন। এই লক্ষ্যকে মোটামোটি ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়—পাঁচরকম মুক্তি এবং প্রাপ্তি। সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্য—এই পাঁচ রকম মুক্তি। সাযুজ্যে সিদ্ধাবস্থায় সাধক উপাস্যের সহিত মিশিয়া তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সাধকের পৃথক্ সত্ত্বা এবং সেব্য-সেবকত্বের ভাব থাকেনা বলিয়া ভক্ত সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না। সালোক্যাদি চারি রকমের মুক্তিতে সিদ্ধাবস্থায় সাধকের পৃথক্ সত্ত্বা থাকে, সুতরাং সেবার সুযোগ থাকে; কিন্তু এই চারি রকমের মুক্তির সেবা ঐশ্বর্য্যভাবময়। তাই শুদ্ধমাধুর্য্য-মার্গের গৌড়ীয়-ভক্তগণ এসমস্তও চাহেন না, তাঁরা চাহেন শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা; তাহাদের লক্ষ্যকে বলে ভগবৎ-প্রাপ্তি। কিন্তু পঞ্চবিধা মুক্তি তাঁহাদের কাম্য না হইলেও এসমস্ত মুক্তির পারমার্থিক সত্ত্বা নাই, এসমস্ত মুক্তি অল্পকাল স্থায়ী—একথা কিন্তু গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বলেন না। এসমস্ত মুক্তিতেও রসস্বরূপ ভগবানের রস-আস্বাদন করিয়া জীব "আনন্দী" হইতে পারে, তবে আস্বাদনের তারতম্য আছে, সকল ভাবে, সকল মুক্তিতে রসের সকল বৈচিত্রীর আস্বাদন হয় না। সকল রকমের আস্বাদন-চমৎকারিতারও অনুভব হয় না। "কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়। কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়। ২।৮।৬৪ ॥" আস্বাদনের বিভিন্নতা আছে বলিয়াই মুক্তিরও বিভিন্নতা। শুদ্ধ-মাধুর্য্যভাবের প্রাপ্তিতেও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবে নানারকম পার্থক্য আছে।

বলা বাহুল্য, এ পার্থক্য কেবল ভগবানের মাধুর্য্য আস্বাদনের চমৎকারিত্বে; মুক্ত কিন্তু সকলেই। যে কোনও রকমের মুক্তিতেই, কিম্বা যে কোনও রকমের ভগবৎ-প্রাপ্তিতেই মায়াবন্ধন হইতে, সংসার হইতে, ত্রিতাপজ্বালা হইতে, জন্মমৃত্যু হইতে সাধক অনন্তকালের জন্য অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। সাধকের রুচিভেদে, প্রকৃতিভেদে—লক্ষ্যভেদ, উপাসনাভেদ; সকল লক্ষ্যেরই সাধারণ ভূমিকা মায়ামুক্তি। গৌড়ীয়-সম্প্রদায় তাহা অস্বীকার করেন না। মুক্তদের মধ্যে পরতত্ত্ব-বস্তুর সেবার এবং মাধুর্য্যাদি আস্বাদনের ভেদেই মুক্তির এবং প্রাপ্তির ভেদ।

লক্ষ্য বিষয়েও গৌড়ীয়দের মত অত্যন্ত উদার। স্বীয়-উপাস্য-স্বরূপে যাঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক না হইলেও তিনি যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন হইতে পারেন, শ্রীলমুরারিগুপ্তই তাহার প্রমাণ। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক হইয়াও মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর পার্ষদ-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ভগবচ্চরণে যাঁহার অচলা নিষ্ঠা থাকে, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও যে কখনও তাঁহাকে শ্রীচরণসেবা হইতে বঞ্চিত করেন না, মুরারিগুপ্তকে উপলক্ষ্য করিয়া এই তথ্যটী প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভু একদিন এক রঙ্গ করিয়াছিলেন। এই রঙ্গটী কি, তাহা বুঝাইবার জন্য এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা হইতেছে। ব্যাপারটী এই। রথযাত্রার সময়ে যে সমস্ত গৌড়ীয়ভক্ত নীলাচলে যাইতেন, চাতুর্ম্মাস্যের পরে তাঁহাদের বিদায়ের কালে মহাপ্রভু প্রত্যেকেরই গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিজের প্রীতি জ্ঞাপন করিতেন। একবার এই ভাবে—"মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন। তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে, শুনে ভক্তগণ ॥ পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার। "পরম মধুর গুপ্ত! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়। বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময় ॥ বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর। সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর ॥ মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস। চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্যে

করে যৈছো লীলা রাস॥ সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়। কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥' এইমত বার বার শুনিয়া বচন। আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥ আমারে কহেন—আমি তোমার কিঙ্কর। তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর॥ এত বলি ঘরে গেলা, চিন্তি রাত্রিকালে। রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তি হইলা বিহ্বলে॥ 'কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ। আজি রাত্রে রাম! মোর করাহ মরণ॥' এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। মনে স্বাস্থ্য নাহি, রাত্রি কৈল জাগরণ॥ প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ। কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥ রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছি মাথা। কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, মনে পাঙ ব্যথা॥ শ্রীরঘুনাথের চরণ ছাড়ান না যায়। তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায়॥ তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়। তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥ এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল। ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন কৈল॥ 'সাধু সাধু' গুপ্ত! তোমার সুদৃঢ় ভজন। আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥ এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়। প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায়॥ তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে। তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥ সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥ সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম। ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন॥ ২।১৫।১৩৭-১৫৭॥"

কি উদ্দেশ্যে প্রভু মুরারিগুপ্তের সঙ্গে এই রঙ্গ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত পয়ারসমূহ হইতে তাহা পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায় যে, বিভিন্ন-ভাবের উপাস্য-সম্বন্ধেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত অত্যন্ত উদার ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে বিচার-বিতর্কাদি করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের হেয়তা-প্রতিপাদনই এই বিচার-বিতর্কের উদ্দেশ্য ছিল না। যথার্থ তত্ত্ব-নির্ণয়ই ছিল ইহার লক্ষ্য। তত্ত্ব-নির্ণয়মূলক বিচার-বিতর্কে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বেঙ্কট-ভট্টের সঙ্গে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল; তাঁহার নিজের মত এবং উপাসনা ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রচারিত মত এবং উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য তিনি কখনও ভট্টকে বলেন নাই। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সঙ্গেও উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার বিচার হইয়াছিল; বিচারে আচার্য্য তাঁহার ত্রুটী বুঝিলেন। কিন্তু প্রভুর নিজের মত গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকেও তিনি বলেন নাই। একথা সত্য, বহু ভিন্ন সম্প্রদায়ী লোক মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ভজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সকলেই যে তর্কে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তর্কের পরাজয়ে সকল সময়ে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শ্রুতিপ্রতিপাদিত আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, পরতত্ত্বের যে মোহন-রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া এবং সেই মাধুর্য্যাদি আস্বাদানের প্রভাবে যে সমস্ত অদ্ভুত প্রেমবিকার লোক তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াই অধিকাংশ লোক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। তাঁহা হইতে বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ-প্রেমরশ্মিও যে সকলের চিত্তে একটী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল অত্যন্ত উদার—জীবমাত্রকেই রসস্বরূপ ভগবানের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল আহ্বান। অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ-খ্যাপনের ইচ্ছা হইতে এই প্রচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মাধুর্য্যের লোভে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশও অন্য সম্প্রদায়ের অপকর্ষ সূচিত করে না; বরং এই সমস্ত লোকের অবচেতনায় যে লোভ প্রচ্ছন্ন ছিল, মহাপ্রভুর সঙ্গপ্রভাবে তাহার পরিস্ফুরণই সূচিত করে।

যাহা হউক, এসমস্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইবে যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর্শে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই।